বিশ্ববিদ্যালয়, ভিসি ও ঐতিহ্য-সমাচার

আসিফ নজরুল

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ১১:০৮
আপডেট: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ১১:৪৬

বেলা বাড়ছে, তবু বাসায় বসে আছি। স্ত্রীকে বললাম: আমি কিন্তু ছুটিতে।

সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে: কিসের ছুটি?

শ্রান্তি বিনোদন!

মানে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকেরা কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে যান। সে জন্যই এ ছুটি! সে হেসে ফেলে। বলে: তোমরা তো সারা বছরই শ্রান্তি বিনোদন করো! এ জন্য আবার ছুটি?

আমি ছোট মুখ করে বসে থাকি। তার কথা পুরোপুরি ভুল নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আমি পড়াই একটি মাত্র সাবজেক্ট বা বিষয়। রুটিনে আছে ক্লাস সপ্তাহে দুদিন, এক ঘণ্টা করে ক্লাস। এ ছাড়া বিভিন্ন মিটিং থাকে, পরীক্ষা কমিটির কাজ থাকে, পরীক্ষা হলে পরিদর্শনে যাই, সারা বছর পরীক্ষার খাতা দেখি। কিন্তু এক সাবজেক্টের শিক্ষক বলে বোঝা যায় না ফুল টাইম চাকরি এটা। তবে এ ছাড়া উপায়ও নেই। আমাদের বিভাগে এত বেশি শিক্ষক এখন যে পড়ানোর জন্য একটার বেশি সাবজেক্ট পাওয়ার সুযোগ নেই তেমন। এমনও হয়েছে কোনো কোনো নতুন শিক্ষক কয়েক মাস পড়ানোর সুযোগই পাননি সাবজেক্টের অভাবে।

আমার বিভাগের মতো একই অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি বিভাগে। এখানে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে যতটা প্রয়োজন থেকে, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে দল ভারী করতে। দল ভারী করা হয় সরকারের প্রতি অনুগত শিক্ষক দল (বিএনপির সময় সাদা, আওয়ামী লীগের সময় নীল) যাতে বিভিন্ন নির্বাচনে জিতে মূলত সেটা নিশ্চিত করার জন্য। এই বিজয়টা খুব প্রয়োজন সরকারের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অনুগত দল শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে জিতলে সেটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, সরকার বা সরকারপন্থী কোনো সংগঠন অন্যায় করলে প্রতিবাদ করে না, এমনকি প্রতিবাদী কোনো শিক্ষক সরকারি ছাত্রসংগঠনের হাতে অপদস্থ হলেও কিছু বলে না। সিন্ডিকেট সদস্য বা ডিন হিসেবে জিতলে বরং এসব অন্যায়ে সহায়তা বা সমর্থন প্রদান করে কখনো কখনো।

অনুগত দল নির্বাচনে জিতলে নির্বিঘ্নে সমমনাদের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রভোস্ট বা আবাসিক শিক্ষক পদে নিয়োগ দিতে পারে। এরা ছাত্রাবাসে সরকারি ছাত্রসংগঠন অরাজকতা কায়েম করলে কিছু বলে না, বিভিন্ন নির্মাণ, মেরামত ও নিয়োগ কাজে চাঁদাবাজি করলে প্রতিবাদ করে না, ভিন্নমত পোষণকারীরা হেনস্তা হলে তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে সাধারণ চিত্র সব আমলে কমবেশি এটাই।

২.

নির্বাচনে জেতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নেওয়ার প্রবণতা শুরু হয় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পর। এরপর ক্রমে ক্রমে তা বেড়ে বর্তমানে ভয়াবহ আকার গ্রহণ করেছে। গত ১০

বছরে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। এদের একটা সিংহভাগ যে সরকারি দলের প্রতি অনুগত তার প্রমাণ হচ্ছে শিক্ষকদের নির্বাচনে সরকারি দলের প্রায় রাতারাতি সাফল্য। আগের বিএনপি আমলে সাদা দল শিক্ষকদের বিভিন্ন নির্বাচনে বেশি জিতত। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতার আসার বছরখানেক পর থেকে জিততে থাকে নীল দল, ক্রমেই তা হতে থাকে আরও একচেটিয়া।

তবে এর মানে এটা নয় যে কোনো শিক্ষকেরই বিবেক বা নিজস্ব বিবেচনাবোধ নেই। কিন্তু নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে সরকারপন্থীদের (কেউ কেউ বাধ্য হয়ে এমন হন) সংখ্যা এত বেশি থাকে যে নির্বাচনে বিজয়ী হয় বিবেক বা অন্য কিছু না, বিজয়ী হয় সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পুরোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত উপাচার্য নিয়োগ হন এই অনুগতদের মধ্য থেকে। বিভিন্ন নির্বাচনে কয়েক দফা জিতে এসে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে আনুগত্য প্রদর্শনে পারদর্শীরা নিয়োগ পান এ পদে। আগে একটা সময় ছিল, যখন এ নিয়োগের সময় উপাচার্যের একাডেমিক এক্সেলেন্স ও ব্যক্তিগত ইমেজ কিছুটা হলেও গুরুত্ব পেত। যে কারণে আওয়ামী লীগ আমলে অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী ও বিএনপি আমলে এস এম এ ফায়েজের মতো উপাচার্য নিয়োগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এরপর উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

সাম্প্রতিক কালে উপাচার্য হিসেবে এ ধরনের ব্যক্তিদের নিয়োগের পেছনে দুটো বিষয় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে সম্ভবত। এক. প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিরোধী রাজনীতির (ছাত্র আন্দোলনভিত্তিক) প্রতি সরকারের ভীতি বেড়েছে। এ কারণে সেখানে ছাত্রসংগঠন নামধারী একটি পেটোয়া বাহিনী রাখার গুরুত্ব বেড়েছে। এ ধরনের পেটোয়া বাহিনীকে সমর্থন বা প্রশ্রয় দিতে পারে কেবল সরকারের অন্ধ অনুগত একজন উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ববিদালয় প্রশাসন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা তাই দেখেছি।

বিগত ১০ বছরে বহু নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে উপাচার্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ ও কম যোগ্য বিভিন্ন শিক্ষকও। দলীয় এসব উপাচার্য কৃতার্থ হয়ে আরও বেশি সরকার অনুগত থেকেছেন, মূল দায়িত্ব পালনে বেপরোয়া শৈথিল্য দেখিয়েছেন। ঢাকায় অবস্থান করে অন্য জেলার ভিসির দায়িত্ব পালন বা কথায় কথায়

শিক্ষার্থী বহিষ্কার করার মতো উপাচার্য তাই আমরা সাম্প্রতিক কালেই শুধু দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে আবার অঞ্চলভিত্তিক দায়মুক্তি পাওয়ার বিশ্বাস বা অহংকারটা যাঁদের বেশি, তাঁরা কতটা বেপরোয়া ধরনের হতে পারেন, তা আমরা গোপালগঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখছি এখন।

উপাচার্যদের মূল সমস্যা জবাবদিহির। তিনি নিয়োগ পান প্রধানত সরকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যর ভিত্তিতে। এই আনুগত্যোর প্রতি তাঁর জবাবদিহি থাকলেই চলে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ভিন্নমতাবলম্বী কোনো প্রবণতা রুখে দেওয়া ও সরকারের অন্ধ গুণগান করে এসব আনুগত্যের প্রমাণ দেওয়া হয়। প্রথম কাজটা কঠিন। এই কঠিন কাজটা করার জন্য তিনি সমমনাদের নিয়ে শিক্ষক প্রশাসন সাজান, মারমুখী অনুগতদের অবাধ প্রশ্রয় প্রদান করেন। বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থান, শিক্ষার মান, গবেষণা কার্যক্রম প্রসারে এমনকি দুর্নীতি-নিপীড়ন প্রতিরোধে তিনি নিন্দনীয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও তাঁকে কারও কাছে জবাব দিতে হয় না। ফলে কিছু কিছু উপাচার্য হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছাচারী।

৩.

কেন একজন উপাচার্য এসব করেন বা তাঁকে এসব করতে হয়? কারণ, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল কাজ কী, তাই আমরা ভুলতে বসেছি। বিশ্ববিদ্যলয়ের আসল কাজ শুধু জ্ঞানদান করা নয়, জ্ঞান তৈরি করা (গবেষণা) এবং তা কাজে লাগানোও (গবেষণার প্রায়োগিক ব্যবহার)।

আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ মূলত প্রথমটি। সেটিও কতটা গৌণভাবে তা প্রথমে উদাহরণ দিয়ে বলেছি। এখানে গবেষণার নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়, তা নিম্নমানের এবং প্রধানত পদোন্নতির অভিলাষে রচিত। ১৫-২০ বছর আগেও একটা মানসম্মত পিএইচডি আর বিদেশি জার্নালে কিছু লেখাসহ ১৫-২০টি গবেষণা ছাড়া অধ্যাপক হওয়ার কথা ভাবা যেত না। এখন অবস্থা বদলেছে। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহু বিভাগে অধ্যাপকের সংখ্যা এখন বাকিদের চেয়ে বেশি!

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন। সরকারের জনসভায় লোক হাজির করা, রাজপথ কাঁপিয়ে সরকারের গুণগান করা এবং সরকারের অপকর্মের কোনো প্রতিবাদ হলে তা কঠোরভাবে দমন করা। অথচ যেকোনো সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার একটি অনন্য ঐতিহ্য ছিল

বাংলাদেশের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। এখনো বাম সংগঠনগুলো, সাধারণ ছাত্ররা বা কিছু শিক্ষক তা করে থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ ব্যস্ত থাকেন তাঁদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে। অনেকে আবার নীরব থাকেন ভোগান্তির ভয়ে।

অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন পরিণত করা হয়েছে সবচেয়ে প্রো-এস্টাবলিমেন্ট প্রতিষ্ঠানে। এটি করা হয়েছে শিক্ষকদের বিভিন্ন পদে বসিয়ে, বিভিন্ন অন্যায়ে দায়মুক্তি দিয়ে, ছাত্রদের অন্যায় ক্ষমতা আর অবৈধ বিত্ত অর্জনের সুযোগ দিয়ে।

এই প্রক্রিয়ার সিইও হচ্ছেন আজকের উপাচার্যরা! বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচাতে হলে এই সিইওদের পাশাপাশি যাঁরা এদের নিয়োগ দেন, তাঁদেরও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

আসিফ নজরুল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক